দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

নব্য-অধিবিদ্যা: প্রসঙ্গ রঘুনাথ শিরোমণির *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*

মোঃ মাসুদ আলম*

সারসংক্ষেপ

বাঙালি দর্শনের যুক্তি-চিন্তন ও তর্ক-ভাষা বিশ্লেষণী অধ্যায়ের পুরোধা দার্শনিক রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৬০-১৫৪০) তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* বইয়ে অধিবিদ্যক আলোচনার এক স্বতন্ত্র দার্শনিক চিন্তাধারা এবং সময়ের বিচারে এক নতুন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এখানে ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহ তিনি যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি ন্যায়-বৈশেষিক মতবিরুদ্ধ অনেক পদার্থ (substance বা দ্রব্য) সম্পর্কেও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। কার্যকারণভাব কিংবা প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব অথবা উদ্দেশ্য, লক্ষণ, বিভাগ, পরীক্ষা প্রভৃতি সুদৃঢ় যুক্তির আলোকে প্রতিপাদন করে যে সকল পদার্থ তাঁর কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়েছে তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং যা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়নি তা সমালোচনা করেছেন। দিক্, কাল, ও আকাশ পদার্থের মৌলিক অস্তিত্ব খণ্ডন করে এগুলোকে তিনি 'ইথার' বলেছেন এবং ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দ্রব্যের অবয়বের জন্য পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অস্তিত্ব খণ্ডন করে তিনি ত্রসরেণুর কথা বলেছেন। শক্তি, স্বত্ব, সাদৃশ্য, ও সংখ্যা ইত্যাদি ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং মীমাংসকসম্মত হলেও এগুলোকে তিনি অতিরিক্ত পদার্থরূপে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে দেশ, কাল, ঈশ্বর, পরমাণুতত্ত্ব, সংখ্যা, স্বত্ব, কার্যকারণ প্রভৃতি নিয়ে রঘুনাথ শিরোমণির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হবে এবং সমকালীন অধিবিদ্যক ধারণার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। এখানে আমি রঘুনাথের পদার্থ বা প্রকরণ (category) সম্পর্কিত আলোচনাকে নব্য-অধিবিদ্যা বলেছি এ কারণে যে তিনি ন্যায়-বৈশেষিক আলোচনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে নতুন এক বিশ্লেষণী ধারার সূত্রপাত করেছেন। অধিকন্তু তাঁর স্বতন্ত্র দার্শনিক চিন্তার মূর্ত বিকাশকে আমি নব্য-ন্যায় প্রত্যয়টির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করতে চেয়েছি। রঘুনাথ দর্শনালোচনার মাধ্যমে জগৎ বিষয়ক জিজ্ঞাসা, ভাষা বিশ্লেষণ ও সাধারণ ভাষার অর্থ সুস্পষ্টকরণের উপর ভিত্তি করে বাংলায় যে নব্য-অধিবিদ্যক আলোচনার সূচনা করেন তা অনুসন্ধান করাই হবে বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।]

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
সংযুক্ত: আলেকান্দা সরকারি কলেজ, বরিশাল

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : নব্য-ন্যায়, ন্যায়-বৈশেষিক, নব্য-অধিবিদ্যা, রঘুনাথ শিরোমণি, পদার্থতত্ত্বনিরূপণ, পদার্থ, দিক্, দেশ, কাল, ঈশ্বর, পরমাণু, স্বত্ব, সংখ্যা, কার্যকারণ, ভাষা বিশ্লেষণ।

প্রাক-কথন

বাঙালি ও বাংলার দর্শন নব্য-ন্যায়ের একজন পুরোধা দার্শনিক হলেন রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৬০-১৫৪০)। অনেক গবেষক ও দর্শন চিন্তাবিদ তাঁকে নব্য-ন্যায়ের জনক বলেও অভিহিত করেন (Ganeri, 2013: 73; Alom, 2018: 47–52)। দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষতা, নতুন করে তৈরি করা দার্শনিক পরিভাষা, যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলায় একটি নতুন দর্শন ধারা প্রবর্তন করেন যা বাংলা ও বাংলাভাষী অঞ্চলের বাহিরেও বিশাল প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়। সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর মৌলিক, উচ্চমার্গীয়, ও নিগূঢ় দর্শন চিন্তার প্রকাশকে সমকালীন ভিটগেনস্টাইন ও দেরিদার শৈলীর সাথে তুলনা করা যায়। তোশিহিরো ওয়াদা ফ্রাইওয়ালনার-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, রঘুনাথকে ভিটগেনস্টাইনের সাথে তুলনা করা যায়। ভিটগেনস্টাইন সংক্ষিপ্ত মূলবাক্য ব্যবহার করে গভীর দর্শন চিন্তাকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন তেমনি রঘুনাথ দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষার সংক্ষিপ্ত বিন্যাস গঠন করে গভীর অনুধ্যানী দর্শন চিন্তা উপস্থাপন করেছেন (Wada, 2007: 12)। রঘুনাথের অনুসারী এবং বাংলার আরেক বিখ্যাত নব্য-নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য রঘুনাথের ক্ষেত্রে একটি সার্থক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন 'সংক্ষিপ্তোক্ত্যতিদক্ষ' এবং রুদ্র তর্কবাগীশ তাঁর *পক্ষতারোদ্রী*র এক জায়গায় শিরোমণিকে 'লিখনসংক্ষেপনির্ব্বন্ধিনো দীধিতিকারস্য' বলে অভিহিত করেছেন (ভট্টাচার্য, ১৯৫২: ৭৯)। রঘুনাথ তাঁর কোনো গ্রন্থেই মূল গ্রন্থের সকল পংক্তি ধরে বিস্তারিত সরল ব্যাখ্যা করেননি (ভট্টাচার্য: ৮০)। তিনি তাঁর দর্শনালোচনায় জগত সম্পর্কিত মৌলিক অনুসন্ধান, নতুন পরিভাষা তৈরি ও তার প্রয়োগ, ভাষা বিশ্লেষণ, সাধারণ ভাষায় যাতে দার্শনিক প্রত্যয় ও তত্ত্বগুলো অনুধাবন করা যায় সেরকম রীতি তৈরি, এবং সাধারণ ভাষার অর্থ সুস্পষ্টকরণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি দর্শনে এক নতুন বিশ্লেষণী অধ্যায়ের সূচনা করেন। বাংলার এ নতুন দার্শনিক অধ্যায় ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ন্যায় ও 'ন্যায়বৈশেষিক' এর সমন্বিত ধারা 'সমানতন্ত্র' থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক (ঘোষ, ২০০৪: ২১৩)।

রঘুনাথ শিরোমণির রচনাবলি মূলত নব্য-ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দাবী করেন যে, ভারতবর্ষের বহু স্থানে নব্য-ন্যায়ের বহু গ্রন্থ রচিত

হলেও কেবল দুইজন দার্শনিক নতুন দর্শন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন- পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি (ভট্টাচার্য: ৭৯)। রঘুনাথের অধিকাংশ রচনাই 'দীধিতি' সম্বলিত যার অর্থ হলো 'আলোকরশ্মি'। তিনি তাঁর রচনাবলির মাধ্যমে জটিল ও তাত্ত্বিক দার্শনিক প্রত্যয়গুলো স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণভাবে (clear and consistent) তুলে ধরেছেন। তবে তিনি সারগর্ভ উক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তি-কাঠামো ব্যবহার করেছেন। *প্রত্যক্ষমণিদীধিতি* রঘুনাথের প্রথম রচনা বলে মনে করা হয়। এখানে তিনি 'প্রামাণ্যবাদ' নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর তিনটি দিকের কথা বলেছেন: জ্ঞাপ্তিবাদ, উৎপত্তিবাদ ও প্রামাণ্যস্বরূপ। এ গ্রন্থে তিনি *তত্ত্বচিন্তামণি*'র প্রত্যক্ষখণ্ডের অতি সামান্য অংশ আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থ সম্পর্কে বাংলার নৈয়ায়িক সমাজে রঘুনাথের একটি শ্লোকার্দ্ধ প্রচলিত রয়েছে: "নমঃ প্রামাণ্যবাদায় মৎকবিত্বাপহারিণে" (ভট্টাচার্য: ৮০)। তিনি প্রত্যক্ষিত জগতকে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলেন ভাষা ও অর্থ বিশ্লেষণের আঙ্গিকে। জ্ঞানের বিষয় হলেই তা অর্থবোধক ভাষায় প্রকাশ করা যায়। *অনুমাণদীধিতি* রঘুনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে প্রতীয়মান হয়। এ বইয়ে তিনি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত স্তুতিবাক্যের পরেই নিজ কাজের প্রশংসা করেন এভাবে: 'প্রতিথযশা তার্কিক শিরোমণি পাঠ ও মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে সকল বইয়ের সারকথা নিংড়ে নিয়ে তৈরি করেছেন *চিন্তামণি*'র *দীধিতি* ভাষ্য। কবি রঘুনাথের এই কাজ পণ্ডিতদের আনন্দের উৎস হতে পারে, কারণ এই বই অন্যের মতকে খারিজ করে দেয়, এতে রয়েছে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির ছাপ এবং প্রাঞ্জল চিন্তার আলোকে সকল ত্রুটি বর্জন করা হয়েছে' (Ingalls, 1988: 11–12)। এ গ্রন্থের শেষেও তিনি যুক্ত করেছেন আত্ম-প্রশংসামূলক শ্লোক: 'অতীতের পণ্ডিত ব্যক্তিরা যে বিষয়ে একবাক্যে সত্য বা মিথ্যা বলে একমত হয়েছেন সে বিষয় সম্পর্কে যখন আমি, যার প্রভু রঘু এবং আমি যে তর্কশাস্ত্রের স্রষ্টা, কোনো কিছু বলি তা অবশ্যই নতুন করে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে' (Ingalls: 12)। 'এ গ্রন্থটি প্রায় ৪০০ বছর ধরে ভারতবর্ষের সর্বত্র- আসাম থেকে গুজরাট এবং কাশ্মীর থেকে কোচিন পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনের সকল অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আকরগ্রন্থ হিসেবে অবশ্য পাঠ্য ছিল' (ভট্টাচার্য: ১০২)। *শব্দমণিদীধিতি* গ্রন্থে রঘুনাথ দার্শনিক ভাষাতত্ত্বকে (philosophical linguistics) কিভাবে দর্শনের একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা তুলে ধরেন। ভারতীয় দর্শনে 'শব্দ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচিত বিষয়। নব্য-ন্যায় দর্শনে মনে করা হয় যে 'শব্দের শক্তি রয়েছে'। শব্দবোধের কারণে শব্দ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। "আখ্যাতবাদ" রঘুনাথের একটি মৌলিক প্রবন্ধ। আখ্যাত পদের মানে হলো ক্রিয়া। এ প্রবন্ধে তিনি ক্রিয়ার অর্থতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। "নঞবাদ" তাঁর অন্য একটি মৌলিক নিবন্ধ। এখানে তিনি অভাব (negation) কে পদার্থ বলে স্বীকার করেন এবং নেতিবাচক পদগুলোর অর্থতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। নব্য-ন্যায়

দর্শনের ভাষাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, ও তত্ত্ববিদ্যক আলোচনায় 'অভাব'কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি যৌক্তিক প্রত্যয় বলে বিবেচনা করা হয়। 'ঘট আছে' যেমন ভাব পদার্থ তেমনি 'ঘট নেই' বা 'ঘটের অস্তিত্বহীনতা' অভাব পদার্থ। সমকালীন প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় দ্বি-নিষেধ সূত্রানুসারে এটা স্বীকার করা হয় যে, $\sim\sim p \equiv p$; কিন্তু রঘুনাথ মনে করেন যে, $\sim\sim p \not\equiv p$ । *দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি* গ্রন্থটিতে রঘুনাথ মানুষের মুক্তি বা মোক্ষ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি বিভিন্ন প্রকার দুঃখ, দুঃখ মুক্তির পথ নিয়ে তাঁর গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। *গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি* গ্রন্থে তিনি কর্ম লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেন। *আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতি* গ্রন্থে তিনি ন্যায়মতবিরুদ্ধ 'নিত্যসুখ' এর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এ গ্রন্থের প্রথম ভাগে তিনি ক্ষণিকত্ব ও ক্ষণত্বের লক্ষণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* তাঁর একটি মৌলিক ও বিখ্যাত গ্রন্থ। এখানে তিনি অধিবিদ্যক আলোচনার এক স্বতন্ত্র দার্শনিক চিন্তাধারা এবং সময়ের বিচারে এক নতুন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এখানে তিনি ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত পদার্থসমূহ যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি ন্যায়বৈশেষিক মতবিরুদ্ধ অনেক পদার্থ (substance বা দ্রব্য) সম্পর্কেও যৌক্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। কার্যকারণভাব কিংবা প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব অথবা উদ্দেশ্য, লক্ষণ, বিভাগ, পরীক্ষা প্রভৃতি সুদৃঢ় যুক্তির আলোকে প্রতিপাদন করে যে সকল পদার্থ তাঁর কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়েছে তা তিনি গ্রহণ করেছেন এবং যা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি তা সমালোচনা করেছেন।

প্রথানুগ অধিবিদ্যার সমালোচনা ও অধিবিদ্যার নতুন অভিমুখ

পদার্থতত্ত্বনিরূপণ বইয়ে রঘুনাথ যে নতুন অধিবিদ্যা আলোচনা করেছেন তা আমি শুরু করতে চাই এ বইয়ের শেষ লাইনের বক্তব্য-বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে। 'প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তিসিদ্ধ পদার্থসমূহ আমি যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছি। প্রাচীন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত পদার্থসমূহ বিনা বিচারে যেন পণ্ডিতগণ বর্জন না করেন। অতএব আপনারা যত্ন সহকারে বিচার করে দেখবেন। আপনারা যারা সর্বশাস্ত্রীয় পদার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ তাঁদেরকে বারবার নমস্কার জানিয়ে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিনীত অনুরোধ করছি যে, আমি যা বলেছি তা আপনারা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন, কারণ এ কথা কেবল আমি প্রথম বলেছি তা নয়। আমার পূর্বসূরিগণ এই রীতির সমালোচনা করলেও তা গৃহীত হয়ে আসছে। যে কোনো গ্রন্থকার তাঁর বলা শাস্ত্রীয় বিষয় বিচার-বিশ্লেষণের জন্য অপরাপর পণ্ডিতবর্গের নিকট অনুরোধ করে থাকেন' (শিরোমণি, ১৯৭৬: ৩৩)। এ কথা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে তিনি প্রথানুগ অধিবিদ্যার বিচার-

বিশ্লেষণ করার জন্য তাঁর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, "অর্থানাং যুক্তিসিদ্ধানাং" অর্থাৎ যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তই অর্থপূর্ণ। এখানে তিনি দার্শনিক ক্রিয়াপরতার (doing philosophy) একটি নতুন পথ, পুরাতন মতবাদকে চালু করার একটি যুক্তিসিদ্ধ কাঠামো প্রচলন করেন। তিনি প্রথানুগ দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে একটি নতুন অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং স্বকীয় যুক্তিচিন্তনের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, রঘুনাথ প্রতিষ্ঠিত নব্য-ন্যায় ধারা প্রকৃতপক্ষে বিকাশ লাভ করেছে দুইটি ভিন্ন অথচ আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত শক্তিশালী অধ্যায় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সমন্বিত ধারা 'সমানতন্ত্র' থেকে। ন্যায় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো জ্ঞানবিদ্যা ও জন-জ্ঞানচর্চা (public debate) এবং বৈশেষিক দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো অধিবিদ্যা ও বাস্তবতার বিশ্লেষণ। ন্যায় দর্শন বাস্তববাদী এবং এখানে মনে করা হয় যে, বস্তুর অস্তিত্ব না থাকলে জ্ঞান হয় না। কেবল বস্তু নয়, জ্ঞান-ক্রিয়ার উৎপাদক হিসেবে যে সব শর্ত কাজ করে তাদের প্রত্যেকটিই বাস্তব ব্যাপক। বৈশেষিক দর্শন একটি বহুত্ববাদী বাস্তববাদ (pluralistic realism) হিসেবে যেমন অসংখ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে তেমনি বহু মৌলিক উপাদান দ্রব্য, গুণ, কর্ম, পরমাণু এবং বহু প্রকার সমবায় ও অসমবায় সম্বন্ধের অস্তিত্ব মেনে নেয়। রঘুনাথ শিরোমণি গতানুগতিক বৈশেষিক দর্শনের তাত্ত্বিক আলোচনাকে তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* বইয়ে যুক্তি-বিচারের বিষয় বলে নির্ধারণ করেন। বৈশেষিক অধিবিদ্যা ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে প্রশস্তপাদের *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থের মাধ্যমে। এটি মূলত কণাদের বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত একটি ভাষ্য। উপমহাদেশীয় দর্শনে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বৈশেষিক অধিবিদ্যার ব্যাপক চর্চা হয়। এই সময়ে রচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের *তত্ত্বচিন্তামণি* গ্রন্থটি দর্শনের একটি নতুন গতি-প্রকৃতি তৈরি করে এবং জ্ঞানবিদ্যাকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে। এই গ্রন্থটি এবং উদয়নের *কিরণাবলী* ও বল্লভের *ন্যায়লীলাবতী* রঘুনাথের অধিবিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তাকে সমৃদ্ধ করে।

বৈশেষিক দর্শনের আলোচনা ধারা সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি। বাস্তব সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মধ্যে মৌলিকভাবে ঐক্য ছিল যে তাঁরা সকলেই বস্তুসত্তার বাস্তববাদী মতকে গ্রহণ করেছেন। প্রাচীনপন্থী বৈশেষিক দর্শন ও রঘুনাথ শিরোমণি মনে করেন যে, ভাষা ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হলো অধিবিদ্যার মুখ্য বিষয় (Williams, 2017: 625) । অধিবিদ্যক বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো সবচেয়ে যুক্তিসংগত উপায়ে মানুষের তৈরি সত্য অবধারণগুলো এবং বাস্তব ঘটনাগুলোর বৈধতা ও

যথার্থতা যাচাই করা। বৈশেষিকগণ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সত্তা সম্পর্কিত অবধারণগুলোকে বোধজাত সামর্থ্যের (cognitive abilities) মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

রঘুনাথ শিরোমণির নব্য-অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় বৈশেষিক দর্শনের প্রকরণ বা পদার্থ তত্ত্বের (system of categories) সমালোচনা। পদের বা শব্দের অর্থ হলো পদার্থ। পদস্য অর্থঃ পদার্থ। বই, খাতা, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি শব্দকে বলে পদ। এই পদগুলো যে সব বস্তুকে নির্দেশ করে তাই হলো তার পদার্থ। পদের দ্বারা যে বিষয় সূচিত হয় তাই পদার্থ। পদার্থ হলো এমন বিষয় যা অভিধেয়, অর্থাৎ যার নাম দেওয়া যায় এবং যার সম্পর্কে চিন্তা করা যায়। পদার্থ চিন্তা ও শব্দের সাথে অলঙ্ঘনীয়ভাবে সম্পর্কিত। নাম শোনার পর যে বস্তুটির জ্ঞান হয় সেটি হলো ঐ নাম বা পদের অর্থ। অর্থাৎ যা জ্ঞানের বিষয় তাই পদার্থ। একটি বস্তু সম্পর্কে পদ বা শব্দ ব্যবহার তখনই সম্ভব হয় যখন তা জ্ঞানের বিষয় হয়। 'কলম' পদটি দ্বারা কলম বস্তুটিকে বুঝতে হলে ঐ বস্তুটিকে জানা দরকার। সারকথা হলো, যা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় তাই পদার্থ (ভট্টাচার্য, ১৯৯০: ১)। একটি পদার্থকে অন্য পদার্থের সাপেক্ষে সংজ্ঞায়িত করা যায় না এবং পদার্থ প্রাথমিক ও আবশ্যিকভাবে চিন্তন ও ভাষার সাথে সম্পর্কিত যা অধিবিদ্যক বিশ্লেষণের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়।

পদার্থের সংখ্যা নিয়ে ভারতীয় দর্শনে একটি দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে এবং রঘুনাথের নব্য-অধিবিদ্যায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয়। পদার্থের সংখ্যা নির্ধারণের উপর ভিত্তি করেই তাঁর বিশ্লেষণী আলোচনার বুনন গড়ে উঠে। রঘুনাথের সময়কাল পর্যন্ত বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের সংখ্যা ৭টি বলে স্বীকার করা হয়: দ্রব্য (substance), গুণ (tropes), কর্ম (motions), জাতি (natural kinds), বিশেষ (ultimate differentiators), সমবায় (inherence), এবং অভাব (absence)। প্রাচীন ন্যায় দর্শনে ১৬টি পদার্থের কথা বলা হয়েছে: প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞান বা প্রমার উপায়), প্রমেয় (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়), সংশয় (বৈপরীত্যজনিত অনিশ্চয়তা), প্রয়োজন (কর্ম-প্রবৃত্তি/ উদ্দেশ্য), দৃষ্টান্ত (প্রামাণ্য উদাহরণ), সিদ্ধান্ত (প্রতিষ্ঠিত বা তত্ত্বগত সত্য), অবয়ব (ন্যায়ানুমানের আশ্রয়বাক্য), তর্ক (প্রাকল্পিক যুক্তি), নির্ণয় (গৃহীত সিদ্ধান্ত), বাদ (সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তর্ক), জল্প (মিথ্যা যুক্তি প্রক্রিয়া), বিতণ্ডা (অসার তর্ক), হেত্বাভাস (অনুপপত্তি), ছল (বাক্-চাতুর্য বা শ্লেষ), জাতি (সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের ভিত্তি), এবং নিগ্রহস্থান (বিচারে পরাজয়ের কারণ)। *ন্যায়-সূত্র* এর প্রথম সূত্রেই বলা হয়েছে যে এই ১৬টি পদার্থের সম্যক জ্ঞান হলেই পরম শ্রেয় বা মোক্ষ লাভ হয়।

পদার্থ সম্পর্কিত আলোচনার ধারাবাহিকতায় ন্যায়-বৈশেষিক বা সমানতন্ত্রে এবং মিথিলাকেন্দ্রিক রক্ষণশীল নৈয়ায়িকগণের ক্ষেত্রে সপ্ত-পদার্থভিত্তিক অধিবিদ্যা অনুসরণ করা হয়। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থে রঘুনাথ এই প্রথার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁর কাছে যা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়েছে তা তিনি গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর যুক্তির বিচারে টিকতে পারেনি তা বর্জন করেছেন এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যায় যা নতুন করে প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়েছে তা তিনি উপস্থাপন করেছেন। উইলিয়ামস রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্যের বরাত দিয়ে রঘুনাথকে রূপান্তরবাদী (reductionist), অপনয়নবাদী (eliminativist), এবং সম্পন্নতাবাদী (irreductivist) বলেছেন (Williams: 626)। রঘুনাথ তিনটি পদার্থ দিক্, কাল ও আকাশ (ইথার)-এর অস্তিত্ব খণ্ডন করে এগুলোকে একটি পদার্থে রূপান্তর করেন যাকে তিনি বলেছেন ঈশ্বর। তিনি দ্রব্য হিসেবে 'বিশেষ' কে অপনয়ন করেছেন এবং পরমাণু ও দ্ব্যণুকের অস্তিত্ব খণ্ডন করে তিনি ত্রসরেণুর কথা বলেছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ সংখ্যাকে একটি গুণ বলে বিবেচনা করলেও রঘুনাথ সংখ্যাকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবার স্বত্বকে তিনি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করে চিন্তার অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নব্য-অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তিনি ৮টি নতুন পদার্থ বা প্রকরণের কথা বলেছেন এবং বিশ্লেষণী যুক্তির আলোকে তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর নতুন ৮টি প্রকরণ হলো: ক্ষণ (moment), স্বত্ব (the property-relator), সংখ্যা (number), বৈশিষ্ট্য (the absential-relator), কারণত্ব (causeness), কার্যত্ব (effectness), শক্তি (causal-efficacy), এবং বিষয়তা (objectness)। বৈশেষিক মতে অভাবকে পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং রঘুনাথ অভাব নিয়ে ভিন্ন একটি গ্রন্থে ব্যাপক ও বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন। তিনিও অভাবকে পদার্থ বলে স্বীকার করেন এবং এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

এখানে রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থ বা প্রকরণ (category) সম্পর্কিত আলোচনাকে নব্য-অধিবিদ্যা বলা হয়েছে এ কারণে যে তিনি ন্যায়-বৈশেষিক আলোচনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে উপমহাদেশীয় অধিবিদ্যক চিন্তায় নতুন এক বিশ্লেষণী ধারার সূত্রপাত করেন। অধিকন্তু তাঁর তত্ত্ববিদ্যক দার্শনিক চিন্তার মূর্ত বিকাশকে নব্য-ন্যায় প্রত্যয়টির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করাও এ প্রবন্ধের অন্যতম একটি লক্ষ্য। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার কাঠামো গড়ে উঠেছে রঘুনাথের *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* (মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কর্তৃক অনূদিত) বইকে কেন্দ্র করে। এই গ্রন্থটি 'পদার্থখণ্ডন' নামেও পরিচিত। বাংলার নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার ও মথুরানাথ তর্কবাগীশ-এর গুরু রামভদ্র সার্বভৌম এই গ্রন্থটির উপর

টীকা রচনা করেন। পরে ন্যায়সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পঞ্চানন দ্বিতীয় টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। এর পরেও হরিরাম তর্কবাগীশের শিষ্য ও গদাধর ভট্টাচার্যের সতীর্থ রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার একটি টীকা লিখেছেন।

দিক্, কাল, আকাশ ও ঈশ্বর

রঘুনাথ শিরোমণি তাঁর *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* বইয়ে মঙ্গলাচারণ করার পরপরই দিক্, কাল, আকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এগুলোকে তিনি ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর দর্শনে দিক্-কাল-আকাশ এর ঈশ্বরে অন্তর্ভাব ঘটেছে। এগুলো ঈশ্বর অতিরিক্ত পৃথক কোনো সত্তা নয়। গতানুগতিক বৈশেষিক দর্শনের দিক্, কাল ও আকাশ সম্পর্কিত ধারণা খণ্ডনের মাধ্যমে তিনি তাঁর যুক্তি তুলে ধরেন। গতানুগতিক ধারা অনুসারে দিক্, কাল আকাশ হলো নবম দ্রব্যের তিনটি (অন্য ছয়টি হলো ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, মন ও আত্মা)। প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনে দিক্ (দেশ) ও কালের তাত্ত্বিক আলোচনায় সমান্তরাল যুক্তি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাচীন বৈশেষিক মত ও ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র (allied systems) অনুসারে দিক্, কাল ও আকাশ হলো নিত্য দ্রব্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দিক্ স্বতন্ত্র দ্রব্য পদার্থ। যার দ্বারা কাছের বা দূরের উপলব্ধি হয় তাকে দিক্ বলা হয়। বৈশেষিক পরিভাষা অনুসারে দেশ বা স্থানকে (space) দিক্ বলা হয়। দিক্ পদার্থে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ- এই পাঁচটি সামান্য গুণও স্বীকার করা হয়। দিক্ নিত্য হলেও এক, অখণ্ড, এবং সর্বব্যাপী (all pervasive) বা বিভু। অর্থাৎ দিকের পরিমাণও পরমমহৎ পরিমাণ। দুইটি ভিন্ন দিকে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দুটি মূর্ত পদার্থ অবস্থিত থাকলে ঐ মূর্ত পদার্থ দুইটির একটিকে অবলম্বন করে অন্য মূর্ত পদার্থে যে নৈকট্য বা দূরত্ব নামক গুণবিশেষকে বিশেষণ করে মূর্ত পদার্থ বিশেষের প্রতীতি হয় বা প্রতীতিমূলে ব্যবহার হয়- এ রকম প্রতীতি বা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কারণকে দিক্ পদার্থ বলা হয় (শিরোমণি, ১৯৭৬: ২)। প্রশস্তপাদ ভাষ্যেও 'এই দিক পূর্ব', 'এই দিক পশ্চিম' - এরূপ প্রত্যয়কে অতীন্দ্রিয় দিক পদার্থের অনুমাপক নির্দেশক (mark, লিঙ্গ) বলা হয়েছে। 'বাংলাদেশ হতে দিল্লী দূরবর্তী' এবং 'বাংলাদেশ হতে কলকাতা নিকটবর্তী' - এ রকম দূরত্ব ও নৈকট্যের নির্দেশক হিসেবে দিক্ পদার্থকে সুনির্দিষ্ট কারণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। 'যত ইদমিতি দিশ্যং লিঙ্গম' - বৈশেষিক সূত্রের এই উক্তির মাধ্যমেও উপরোল্লিখিত প্রতীতি বা ব্যবহারকে দিক্ পদার্থের জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। আমরা যে বলি প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, অবাচ্য- এগুলো ব্যবহারের কারণ হলো দিক। প্রয়োগে উপস্থিত হলে অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োগ থাকলে ব্যক্তি দিকের জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে। যে

স্থান প্রথমে আসে তা নিকট এবং যে স্থান পরে আসে তা দূর- এ বক্তব্যে কোনো সন্দেহ নেই। এই নৈকট্য ও দূরত্ব দ্রব্য হতে পারে না। কারণ এরা রূপহীন ও প্রত্যক্ষের অতীত। আবার এরা দ্রব্যের সমবায়ী কারণ নয়। এরা দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্যকে নিমিত্ত করে এদেরকে বুঝতে হয়। দিক্ কার্যমাত্রের প্রতি নিমিত্ত কারণ হয়। তাই দিককে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

রঘুনাথ শিরোমণি দিক্ পদার্থকে অতিরিক্ত দ্রব্য পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে দিক্ পদার্থ ঈশ্বর হতে অভিন্ন। খণ্ডিত দিক্ স্বরূপ উপাধি বিশেষের দ্বারা পরিচ্ছন্ন ঈশ্বরকে দৈশিক দূরত্ব বা নৈকট্য বুদ্ধির কারণ বলে স্বীকার করলেই পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতি অথবা নিকট বা দূর প্রভৃতির ব্যবহারের প্রমাণ হতে পারে। সুতরাং ঈশ্বরের অতিরিক্ত দিক্ পদার্থ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অখণ্ড, সর্বব্যাপী বা বিভু, নিত্য পরমেশ্বরকে যখন জগতকারণ স্বীকার করতেই হয় তখন দিক্ স্বরূপ অতিরিক্ত বিভু পদার্থ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয় (শিরোমণি: ৪)।

দিক্ নিয়ে আলোচনার পর রঘুনাথ কাল নিয়ে আলোচনা করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে কালও একটি দ্রব্য বলে স্বীকৃত। তবে সাংখ্য ও যোগদর্শনে মহাকাল বা মহাদিক পদার্থ হিসেবে স্বীকৃত নয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত- এ রকম ব্যবহার এবং জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ব্যবহার কালের দ্বারাই সম্ভব। এ সকল ব্যবহারের কারণ হলো কাল। অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ* বইয়ের ১৫ নং সূত্রে বলেন: "অতীতাদি ব্যবহারহেতুঃ কালঃ"। স চৈকো বিভুর্নিত্যশ্চ" (২০০৬: ১৭০)। অতীত আদি ব্যবহারের হেতু হলো কাল। কাল এক, বিভু (all pervasive) ও নিত্য। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে অখণ্ড কাল বা মহাকাল স্বীকৃত। কিন্তু কাল অখণ্ড হলে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যত ব্যবহার সম্ভব নয়। তাই খণ্ডিত কাল উপাধি অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। কাল উপাধি বা সম্বন্ধের দ্বারাই যখন বস্তুগত ব্যবহারের প্রমাণ হয়, তাই সাংখ্যাচার্যগণ মহাকালকে পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেন না। যোগদর্শনে বলা হয়েছে: "স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" (শিরোমণি: ৫)। এই সূত্রে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়। সূত্রে কাল দ্বারা খণ্ডকালকেই নির্দেশ করা হয়েছে। বিশিষ্ট বা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুমাত্রই অবচ্ছেদক বা উপাধি হয়ে থাকে, বিভু পদার্থ নয়। অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগ দর্শনে খণ্ডকাল স্বীকার করা হয়েছে। আবার খণ্ডকাল স্বীকার না করা হলে 'বর্তমানে ঘট আছে', 'অতীতে ঘট ছিল', 'ভবিষ্যতে ঘট থাকবে'- ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান এই সকল ব্যবহার সম্ভব হতো না।

রঘুনাথ শিরোমণি সাংখ্য, যোগ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মহাকাল বা মহাদিক্ খণ্ডন করেছেন- বিষয়টি এ রকম নয়। নব্য-ন্যায়ে যে সকল পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে

তার মূলে প্রমাণ হিসেবে প্রতীতি বা অনুভব এবং প্রতীতিমূলক ব্যবহার অনুসরণ করা হয়েছে। আমরা কালকে অবলম্বন করে যা কিছু অনুভব করি বা ব্যবহার করি তা কালের উপাধি স্বরূপ খণ্ডকালকে অবলম্বন করেই করি। অখণ্ড বিশ্বব্যাপী মহাকালকে অবলম্বন করে কোনো প্রকার প্রতীতি বা ব্যবহার দেখা যায় না। সিদ্ধান্ত লক্ষণে জগদীশ তর্কালঙ্কারও বলেছেন 'সমকালে', 'তৎকালে' রূপে খণ্ডকাল ব্যতিরেকী অতিরিক্ত মহাকাল বিষয়ক প্রতীতি অনুভবসিদ্ধ নয়। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে মহাকালগোচর কোনো প্রতীতি বা ব্যবহার হয় না বলে অষ্ট পদার্থেও অতিরিক্ত মহাকাল বলে কোনো পদার্থ রঘুনাথ স্বীকার করেন না।

যদি 'বর্তমান', 'অতীত' প্রভৃতি প্রতীতির বিষয় খণ্ডকাল মহাকাল বলে স্বীকৃত হয় তাহলে 'অতীতে এখানে ঘট ছিল না' এবং 'বর্তমানে এখানে ঘট আছে' - এরূপ প্রতীতি হতে পারে না; এটি স্ববিরোধী। কারণ 'বর্তমান' পদবাচ্য মহাকালে ঘট অস্তিত্ববাণ থাকায় 'অতীত' পদবাচ্য মহাকালে ঘটের অভাব থাকতে পারে না। নব্য-ন্যায়ের এ মতের বিরুদ্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ যদি বলেন, 'বর্তমানে এখানে ঘট আছে' এ রকম প্রতীতির বিষয় মহাকাল হলেও শুদ্ধ মহাকাল এ রকম প্রতীতির বিষয় নয়। বরং সৌর জগতের ক্রিয়ারূপ উপাধি বিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহাকালই এ রকম প্রতীতির বিষয় হবে। প্রাচীনগণের এ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক নয়। যদি সৌরজগতের ক্রিয়াবিষয়ক মহাকালকে 'বর্তমান', 'অতীত' প্রতীতির বিষয় স্বীকার করতে হয় তাহলে সৌরজগতের ক্রিয়ারূপ কাল উপাধিকে এ রকম প্রতীতির বিষয় স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত।

আবার, 'কারণে কালঃ' অর্থাৎ কারণের জন্য কালের প্রতীতি হয়। কাল পার্থিব বস্তুর আধার এবং বস্তুর কারণেই কালের প্রতীতি হয়। তাই কাল নিমিত্ত কারণ। কাল সর্বব্যাপী থাকলেও বস্তুর সাথে অবচ্ছেদক সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই রঘুনাথ নব্য-ন্যায় মতানুসারে বলেন, কাল যেমন বিভু পদার্থ তেমনি ঈশ্বরও বিভু পদার্থ। তাই বস্তুর সাথে সংযোগ সম্পর্কে সম্পর্কিত মহাকালকে গ্রহণ না করে বিভু পদার্থ যে ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। যে কাল উপাধিকে অবলম্বন করে প্রাচীনগণ মহাকাল প্রমাণ করে থাকেন সে কাল উপাধি বিশেষকে অবলম্বন করে ঈশ্বর অন্তর্ভাবে 'বর্তমান', 'অতীত' প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভবপর হয়। তাই ঈশ্বরের অতিরিক্ত মহাকাল স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। এ কারণে রঘুনাথ বলেন, 'দিক্ এবং কাল ঈশ্বর হতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তার অনুকূল প্রমাণ নাই' (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*, সূত্র-২)।

রঘুনাথ যে যুক্তিতে দিক্ ও কালকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেননি এবং ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ঠিক একই যুক্তিতে তিনি আকাশ (ইথার) কে ঈশ্বরে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আকাশ ব্যতীত শব্দের অন্য কোনো আশ্রয় নেই। কিন্তু শব্দ একটি বিশেষ গুণ এবং বিশিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করেই এর অনুভব হয়। রঘুনাথ শিরোমণি বলেন, নিত্য-বিভু আকাশ যদি উপাধি বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে শ্রবণ ইন্দ্রিয়রূপে গৃহীত হতে পারে তাহলে ঈশ্বর কর্ণশষ্কুলীরূপ উপাধি বিশেষের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে শ্রবণ ইন্দ্রিয়রূপে পরিচিত হতে পারবে না কেন? অতএব, শব্দও জ্ঞানাদির ন্যায় ঈশ্বরে সমবেত। তাই অতিরিক্ত পদার্থ হিসেবে আকাশকে স্বীকার করা অপ্রয়োজনীয়।

পরমাণুবাদ খণ্ডন

রঘুনাথ শিরোমণি মনে করেন যে, 'পরমাণু ও দ্ব্যণুকের (সাধক) কোনো প্রমাণ নেই। অবয়ব অবয়বি-ভাবের ত্রুটির জন্য ত্রসরেণুতেই বিশ্রান্তি বা সমাপ্তি স্বীকার করতে হয়। প্রাচীনগণ যেহেতু ত্রসরেণুকে চাক্ষুস দ্রব্য বলে মানেন তাই ত্রসরেণু সমবেতরূপেই ঘটরূপ, পটরূপ প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ ত্রসরেণুই হলো দ্রব্যের সমবায়ী কারণ (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*: ৭০)। অবিভাজ্য পরমাণু নিরাকার ও অপ্রত্যক্ষযোগ্য। দুটি অণু মিলে যে দ্ব্যণুক তা আকারবিশিষ্ট কিন্তু অপ্রত্যক্ষযোগ্য। তিনটি দ্ব্যণুক মিলে 'ত্রসরেণু' বা 'ত্র্যণুক' বা 'ত্রুটি' গঠন করে। কখনো কখনো দ্ব্যণুককেও 'ত্রুটি' বলা হয়। ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক আকারবিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষযোগ্য। ছিদ্রপথে গৃহের মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করলে যে ধূলিকণাকৃতি দেখা যায় তাই হলো ত্রসরেণু।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় আরম্ভবাদী। তাঁদের মতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্য মাত্রই পরমাণু থেকে আরম্ভ হয়ে থাকে। পরম সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক ত্রয়ের সংযোগ হতে ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু উৎপত্তিক্রমে ঘট, পট প্রভৃতি বাস্তব আকারবিশিষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হয়। পরমাণুতে প্রাথমিক কার্যদ্রব্যের আরম্ভক বা সমবায়িকারণ স্বীকৃত হওয়ার ফলে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়কে আরম্ভবাদী বলা হয়। একটি দ্রব্যকে বিভাজন করতে করতে যে সূক্ষ্ম ও আকারহীন অবস্থায় উপনীত হয় যাকে আর বিভাজন করা যায় না। যাবতীয় যৌগিক বস্তুকে অণু পরিমাণে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজন করলে এমন অসংখ্য অবিভাজ্য অতি-তম অংশে পৌঁছানো সম্ভব যেসব অংশের আর অংশ হয় না। এ রকম অসংখ্য চরম সূক্ষ্মতম জড়কণার নাম পরমাণু (ultimate constituent element of existence)। মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে এভাবে বলেন: 'যার নিজের অবয়ব নেই, কিন্তু যে পরম্পরা সকলেরই অবয়ব এবং যা সকল সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সীমা স্বরূপ তাকে পরমাণু বলা হয়' (ঘোষ, ২০০৪: ১৯৯)। নিরবয়ব বলে পরমাণুর বিনাশ নেই। এরা নিরংশ, নিত্য, ও অনন্ত। এখানেই প্রশ্ন উঠে,

যার আকার নেই তা কি করে আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপত্তির কারণ হয় অথবা দ্রব্যের বিভিন্ন বর্ণ ও রসভেদ অনুভূত হয় কিভাবে?

এখানে রঘুনাথ শিরোমণি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান (common sense) ব্যবহার করেন এবং অপনয়নবাদী ও প্রয়োজনবাদী (pragmatic) মত তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, ত্র্যণুক বা ত্রসরেণু প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় তা সকল অবয়ব-অবয়বিধারার কারণ। সমজাতীয় পরমাণুর মধ্যে সংযোগের অনুকূল ক্রিয়াবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং এক পর্যায়ে প্রত্যক্ষযোগ্য ও আকারবিশিষ্ট ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। এই ত্রসরেণুই সকল দ্রব্যের অন্ত্যাবয়ব। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রঘুনাথ বিভিন্ন ধরণের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। বস্তুজগতের গঠনের ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই বস্তুজগত গঠনের কারণ হিসেবে তিনি আকারবিশিষ্ট ত্রসরেণুর কথা বলেন যা বিভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে বস্তু গঠন করে। অধিকন্তু, আধুনিক পরমানুবাদ যেখানে অত্যাধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত সেখানে রঘুনাথের পরমানু-চিন্তা পুরোপুরি অনুধ্যানের উপর নির্ভরশীল।

সংখ্যাতত্ত্ব

'একটি ঘট', 'দুইটি দ্রব্য', 'তিনটি টেবিল' ইত্যাদি গণনা ব্যবহারের বিশেষ কারণ হলো সংখ্যা। 'একাদি' ব্যবহারের বা গণনা ব্যবহারের কারণ হলো সংখ্যা। সংখ্যাকে বিশেষ কারণ বলা হয় এজন্য যে, এটিকে সাধারণ কারণ বললে তা কালের ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্য হয়ে যায়। 'একাদি', 'গণনা' শব্দের অর্থ হলো সংখ্যাত্ব। সংখ্যাত্ব জাতি সংখ্যার লক্ষণ। সংখ্যা বিশেষ কারণ হওয়ায় যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সংখ্যাকে গুণ বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়, শঙ্কর মিশ্র, নব্য-ন্যায় দর্শনে এবং রঘুনাথ সংখ্যাকে অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলে স্বীকার করেন। রঘুনাথ মনে করেন, 'সংখ্যা অতিরিক্ত পদার্থ, গুণ নয়। কারণ গুণেও সংখ্যার প্রতীতি হয়' (*পদার্থতত্ত্বনিরূপণ*: ৬৪-৫)।

ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় মনে করেন যে, দ্রব্যের সংখ্যা গুণ না থাকলে আমাদের পক্ষে দ্রব্যের গণনা সম্ভব হতো না। আমরা বলি, 'একটি কলম', 'দুইটি চেয়ার', 'তিনটি পাখি' ইত্যাদি। দ্রব্যের যে গুণ এই 'এক', 'দুই', 'তিন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের কারণ হয় তাই সংখ্যা। কলমটিতে 'একত্ব' সংখ্যা থাকায় 'একটি কলম', চেয়ার দুটিতে দ্বিত্ব সংখ্যা থাকায় 'দুইটি চেয়ার' এ রকম ভাষা ব্যবহার করতে পারি। কলমটির একত্ব সংখ্যা তার আশ্রয় দ্রব্যটির স্বাভাবিক গুণ। কিন্তু চেয়ার দুটির যে দ্বিত্ব সংখ্যা তা আমাদের গণনামূলক

বোধজনিত। প্রথম চেয়ারটিকে এক বলে জানলাম, দ্বিতীয় চেয়ারটিকেও এক বলে জানলাম। তার ফলে চেয়ার দুটির দ্বিত্ব সংখ্যার জ্ঞান হলো। তিন, চার ইত্যাদি সংখ্যাও এই রকম বোধ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই বোধকে ন্যায়-বৈশেষিক, নব্য-ন্যায় দর্শনে 'অপেক্ষা বুদ্ধি' বলা হয় যার সরলার্থ হলো গণনামূলক বোধ বা enumerative cognition। দুই বা ততোধিক সংখ্যার উৎপত্তিতে 'এটা এক', 'এটা এক'- এ রকম জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলে এই জ্ঞান বা বুদ্ধিকে অপেক্ষা বুদ্ধি বলা হয়। অর্থাৎ অনেককে বিষয় করে প্রত্যেকটিতে যে একত্বের জ্ঞান হয় তাই অপেক্ষা বুদ্ধি। কোনো তলে অনেক দ্রব্য থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি 'এই একটি', 'এই একটি' এভাবে গণনা না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যা উৎপন্ন হয় না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞাতার বুদ্ধি দ্বারা উৎপন্ন হলেও এগুলো জ্ঞাত দ্রব্যেরই গুণ। 'দুই', 'তিন', 'চার' ইত্যাদি সংখ্যার উৎপত্তি প্রক্রিয়াটি এ রকম: দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, চতুরত্ব ইত্যাদি সংখ্যার উৎপত্তিতে যে দুটি বা তিনটি বা চারটি দ্রব্যকে আমরা গণনা করছিসেই দ্রব্যগুলোই সমবায়িকারণ; দ্রব্যগুলোর প্রত্যেকটির একত্ব সংখ্যা অ-সমবায়িকারণ এবং প্রত্যেকটি দ্রব্যের একত্বের জ্ঞান নিমিত্ত কারণ। দুটি চেয়ারকে আমরা যখন মিলিতভাবে দুই বলে জানি, তখন দ্বিত্ব সংখ্যাটির আশ্রয় দুটি দ্রব্যই, কিন্তু মিলিতভাবে। এজন্য দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ইত্যাদি সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম বলা হয়। যে ধর্ম একাধিক পদার্থ ব্যাপিয়া থাকে তাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি বলা হয়।

রঘুনাথ শিরোমণির ক্ষেত্রে 'অপেক্ষা-বুদ্ধি', ব্যাসজ্যবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে কোনো সমস্যা না হলেও তিনি সংখ্যাকে গুণ হিসেবে স্বীকার করেন না। তিনি সংখ্যাকে স্বতন্ত্র একটি পদার্থ বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন, 'এক রূপং' বা 'এক রূপ', 'ষড় রসাঃ' বা 'ছয় রস', 'চতুর্বিংশতি গুণাঃ' বা 'চব্বিশ গুণ' ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের যথার্থ প্রতীতি হয়ে থাকে। বৈশেষিক মতানুসারে, গুণ কেবল দ্রব্যের সাথে সমবায় সম্বন্ধে (inhere in substance) থাকতে পারে, অন্য কোনো গুণ বা গতিতে নয়। তাহলে, সংখ্যা যদি গুণ হয় তবে তা অন্য কোনো গুণ বা রূপের সাথে প্রযুক্ত হতে পারে না। যদি প্রয়োগ করা হয় তবে তা হবে 'ভ্রান্ত অবধারণ' (erroneous judgements)। সংখ্যাকে গুণ বিবেচনা করে তাকে আবার গুণ বা গুণবত্ত্ব রূপের উপর আরোপ করা হলে তা স্ববিরোধী হবে এবং অর্থাপত্তি দেখা দিবে। আবার, সংখ্যা যদি গুণ হয় তবে 'একটি ঘট' এর ক্ষেত্রে একত্ব গুণটি সমবায় সম্বন্ধে থাকে; ঘটত্ব জাতির দ্বিত্বাদি সংখ্যাও সেরকম বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ রকম দ্বিত্বাদি সংখ্যার প্রতীতির ক্ষেত্রে আপত্তি দেখা দেয়। কারণ এক্ষেত্রে গুণের উপর গুণ আরোপ করতে হয়। ফলে অর্থগত বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কিন্তু সংখ্যাকে পদার্থ বলে স্বীকার করলে এ ধরণের বিপত্তি বা অর্থাপত্তি তৈরি হয় না।

স্বত্ব

ভারতীয় দর্শন ও বাঙালি নব্য-ন্যায় দর্শনে স্বত্ব নিয়ে ব্যাপক পরিসরে বহুবিধ আলোচনা দেখা যায়। মিথিলাকেন্দ্রিক নৈয়ায়িকগণ ও রঘুনাথ শিরোমণি মনে করেন যে, স্বত্ব (ownness বা property) বাস্তব জগতের একটি বৈশিষ্ট্য। কিছু নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এটি বস্তুর মধ্যে প্রতিপন্ন হয় এবং মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। সমানতান্ত্রিক দর্শনে এবং প্রথম দিকের নব্য-নৈয়ায়িকগণ 'স্বত্ব'কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেননি। কিন্তু *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* বইয়ে রঘুনাথ স্বত্বকে পদার্থ হিসেবে স্বীকার না করার পূর্ববর্তী দার্শনিকদের যুক্তির সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, স্বত্বকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে অবশ্যই আমাদের মেনে নিতে হয়।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভো, ক্রয়ো, জয়ঃ। প্রয়োগঃ কর্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ।" (মনু, ১০। ১১৫)। অর্থাৎ দায়, লাভ, ক্রয়, বিজয়, প্রয়োগ, কর্মযোগ এবং সৎপ্রতিগ্রহ- এই সাতটি উপায় হতে প্রাপ্ত যে সম্পদ তাতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। *মনুসংহিতায়* দানকে স্বত্বের কারণ না বললেও 'প্রদানং স্বাম্যকারণম্' - এই শাস্ত্রীয় বচন অনুসারে দান থেকেও স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়, ব্রাহ্মণকে গরু দান করার পরে, 'এই গরুটি ব্রাহ্মণের, আমার নয়' - এ রকম সার্বজনীন প্রতীতি হয়। যখন কোনো সম্পদে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন 'স্বস্য ভাবঃ' হয় অর্থাৎ কোনো বস্তুতে আমার স্বত্ব রয়েছে- এর মানে হলো আমি বস্তুটি আমার খুশি মতো ব্যবহার করতে পারবো। রঘুনাথ স্বত্বের একটি গভীর তাৎপর্য উপস্থাপন করেন। মাইকেল উইলিয়ামস (২০১৭: ৬৩৫) রঘুনাথের যুক্তিটিকে নিম্নোক্ত ডায়ালগ আকারে তুলে ধরেন:

> রঘুনাথ : তাহলে স্বত্ব হলো একটি স্বতন্ত্র পদার্থ।
>
> প্রতিপক্ষ: একজন ব্যক্তির খুশি মতো (কোনো কিছু) ব্যবহারের সামর্থ্য ছাড়া (স্বত্ব) আর কিছুই নয়।
>
> রঘুনাথ : তাহলে, ব্যবহার বলতে সুনির্দিষ্টভাবে কি বুঝায়?
>
> প্রতিপক্ষ: খাওয়া বা অন্য কিছু।
>
> রঘুনাথ : এটা ঠিক নয়, কারণ একজন ব্যক্তি অন্যের অধিকারে থাকা খাবারও খেতে পারেন।
>
> প্রতিপক্ষ: শাস্ত্রে তার নিষেধ আছে।

রঘুনাথ : শাস্ত্রের কোন অংশ তোমার মনে রয়েছে?

প্রতিপক্ষ: পর সম্পদ গ্রহণ করা উচিত নয়- শাস্ত্রের এ রকম কথা।

রঘুনাথ : তাহলে, স্বত্বের জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত অন্যের স্বত্বাধীন থাকা খাবার গ্রহণের নিষেধ বোধ হতে পারে না। পূর্বে যদি স্বত্বের জ্ঞান থাকে তাহলেই কেবল শাস্ত্র নির্দেশিত অন্যের খাবার গ্রহণের নিষেধ জ্ঞান হতে পারে। অতএব, স্বত্বকে অতিরিক্ত পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

এখানে রঘুনাথ শিরোমণি ভাষা বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, কোনো ধারণা সম্পর্কে আমাদের প্রতীতি হতে হলে তার অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা না থাকলে সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয় না। উইলিয়ামস রঘুদেবের বরাত দিয়ে এমনটি বলেন, 'শাস্ত্র স্বত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে যা বলে তা বোঝার জন্য শুরুতেই আমাদের স্বত্ব সম্পর্কিত ধারণা থাকা প্রয়োজন' (২০১৭: ৬৩৫)। রঘুনাথ স্বত্বকে পদার্থ হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছেন।

কার্য ও কারণ

কারণের জন্যই কার্য সংঘটিত হয়। কারণ কার্যের পূর্বগামী এবং কার্য উৎপন্ন হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কারণ উপস্থিত হয়। কার্যের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে কারণ কোথায় উপস্থিত থাকে? কারণ মাত্রেই কার্যের অধিকরণে কার্যটি উৎপন্ন হওয়ার পূর্বক্ষণে উপস্থিত থাকে। কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত, শর্ত নিরপেক্ষ, ও অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনাবলির সমষ্টি। কারণ ও কার্য একই অধিকরণে একই সময় উপস্থিত থাকে। কার্যের সাথে যার সামানাধিকরণ্য নেই তা কারণ নয়। সুতা কাপড়ের কারণ বলে স্বীকৃত। সুতা কাপড়ের পূর্বগামী অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে আগে সুতা, পরে কাপড়। এ কারণে বলা হয়, কারণ কার্যের পূর্ববৃত্তি পদার্থ। সুতা যে কেবল ক্ষেত্রবিশেষে কাপড়ের পূর্বগামী, তা নয়। যখন, যেখানেই কোনো কাপড় উৎপন্ন হয়, তার পূর্বে সুতা থাকে। এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে না যেখানে পূর্বে সুতা জোগাড় হয়নি, অথচ কাপড় উৎপন্ন হয়েছে। এজন্য কারণকে কার্যের শুধু পূর্ববৃত্তি পদার্থ বলা হয় না, নিয়ত পূর্ববৃত্তি পদার্থ বলা হয়। সুতা যে শুধু কাপড় উৎপত্তির পূর্বে নিয়মিত থাকে তা নয়, কাপড় উৎপত্তির জন্য সুতা অপরিহার্য। কাপড়ের সকল নিয়ত পূর্ববৃত্তি পদার্থ কিন্তু এ রকম নয়। যেমন সুতার রংও কাপড়ের নিয়ত পূর্বগামী পদার্থ। সুতা কাপড়ের পূর্বে সর্বদা থাকে, আর সুতা থাকলে তার রংও থাকে। কিন্তু

কাপড় উৎপত্তির জন্য যা অপরিহার্য তা হলো সুতা। সুতায় রং থাকে বটে, কিন্তু তা কাপড় বানানোর কাজে লাগে না। এজন্য সুতাকে কাপড়ের কারণ বলা হয়, সুতার রং কে নয়। এ রকম যে নিয়ত পূর্বগামী পদার্থ যা কার্য উৎপত্তির জন্য অপরিহার্য নয় তাকে বলে অন্যথা সিদ্ধ। যা অন্যথাসিদ্ধ না হয়ে কার্যের অপরিহার্য ও নিয়ত পূর্ববৃত্তি তাই কার্যের কারণ।

প্রচলিত দর্শনে ও ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কারণ তিন প্রকারের হয়: সমবায়িকারণ (inherence-cause), অসমবায়িকারণ (non-inherence-cause), এবং নিমিত্ত কারণ (instrumental or efficient cause)। যার সাথে সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্যটি উৎপন্ন হয় তাকে ঐ কার্যের সমবায়িকারণ বলে। যেমন, সুতা হলো কাপড়ের সমবায়িকারণ; সুতার সাথে কাপড় সমবায়ি সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। একটি কার্যের সমবায়িকারণ অন্য যে কারণগুলোর সাথে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে তাদেরকে অসমবায়িকারণ বলে। যেমন, কাপড়ের কারণ সুতা; সুতার বুনন ও রং সুতার সাথে সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। তাই সুতার বুনন ও রং কাপড়ের অসমবায়িকারণ। গুণ ও কর্ম ব্যতীত আর কিছু অসমবায়িকারণহতে পারে না। অসমবায়িকারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এই কারণ নষ্ট হলে কার্য-দ্রব্যটি নষ্ট হয়ে যায়। যে সব কারণ সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ থেকে ভিন্ন তাকেই বলে নিমিত্ত কারণ। যেমন, তাঁতী, তাঁত ইত্যাদি কাপড়ের নিমিত্ত কারণ।

রঘুনাথ শিরোমণি কারণ ও কার্যের স্বরূপ নির্ণয়ে পূর্বাচার্যগণের পদ্ধতি ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেন, কারণ কার্যের অপরিহার্য ও নিয়ত পূর্ববৃত্তি গুণ নয়। কারণত্ব বা কার্যত্ব এমন কোনো দ্রব্যগুণ নয় যা পদার্থে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বরং কারণ ও কার্য হলো অতিরিক্ত পদার্থ। কার্য ও কারণ সম্পূর্ণ আলাদা এবং প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র পদার্থ। উইলিয়ামস রঘুদেবের বরাত দিয়ে বলেন যে, রঘুনাথ তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে দুটি সমস্যার সমাধান করেছেন। প্রথমত: কারণ যদি একক সত্তা হয় তাহলে, কারণিক বচনের বৈচিত্র আমরা ব্যাখ্যা করবো কীভাবে? রঘুনাথ এর উত্তরে বলেন, আমদের বিভিন্ন ধরণের কারণিক বচন তৈরির জন্য কাজ করে কারণগুলোর উৎপাদিত কার্যগুলোর পার্থক্য এবং কারণের অবচ্ছেদকগুলোর মধ্যে পার্থক্য। 'অবচ্ছেদক' হলো এমন বৈশিষ্ট্য যা কোনো বিষয়ের যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এবং একটি সাপেক্ষ গুণের সীমা (domain) নির্ধারণ করে দেয়। জ্ঞান বস্তুকে কীভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ একটি বস্তু কীভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠে তা অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা জানা যায়। যদি এটা বলা হয় যে, "কুমারের দণ্ড হলো পটের কারণ" তাহলে এটা বলা যায় যে, "পটের দ্বারা দণ্ডত্বের কারণাবচ্ছেদক বর্ণনা করা হলো"। দ্বিতীয়ত: রঘুনাথ মনে করেন যে, অবচ্ছেদক ধর্ম যুক্ত হওয়ার ফলে অনুগত কারণত্বের (consecutive

causeness) বা অনুগত কার্যত্বের (consecutive effectness) প্রতীতি বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। তিনি এটাও বলেন, এটা আরো সম্ভব এ কারণে যে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্তরের গুণ কারণতাত্বরূপ ও কার্যতাত্বরূপ যুক্ত হয় যা অনুগত ধর্ম হিসেবে কাজ করে।

ভাষা বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে অধিবিদ্যার নব্য পাঠ

রঘুনাথ শিরোমণির পদার্থকে কোন অর্থে প্রকরণ (category) বলা যায় তা বিচার করা আবশ্যক। এরিস্টটল প্রথম প্রকরণ সম্পর্কিত ধারণাটি আবিষ্কার ও ব্যবহার করেন। তিনি ১০টি প্রকরণের কথা বলেন: দ্রব্য, পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ, দেশ, কাল, অঙ্গসংস্থান (posture), স্বত্ব (property), ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), এবং নিষ্ক্রিয়তা (নিবৃত্তি)। এরিস্টটল মনে করেন, এই পদার্থগুলো সকল প্রকার যুক্তিবাক্যের মৌল বিধেয় মাত্র (ঘোষ, ২০০৪: ১৮৫)। তিনি চিন্তার উপাদান হিসেবে প্রকরণগুলোকে তালিকাভুক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন প্রকার বিধেয়ক এবং বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। এরিস্টটলের প্রকরণগুলো তাই বস্তুগত বা বৈষয়িক। কান্টের দর্শনে আমরা ১২টি প্রকরণ দেখি: একত্ব, বহুত্ব, সমগ্রত্ব, সত্তা, অসত্তা, সীমাবদ্ধ, দ্রব্য ও ধর্মের সম্বন্ধবাচক সমবায়, কার্যকারণ, ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া, সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, এবং অনিবার্যতা ও অনির্দিষ্টতা। কান্টের এ প্রকরণগুলো হলো শুদ্ধ বুদ্ধির আকার এবং যৌক্তিক অবধারণে এগুলো বিধেয়ক হিসেবে কাজ করে। এই প্রকরণগুলো ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। তাহলে প্রশ্ন উঠে, মানুষের অভিজ্ঞতার সাথে এগুলোর সম্পর্ক হয় কীভাবে? দেশ ও কালের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুভবকে জ্ঞানের আকারে সাজানো হয়। হেগেলের দর্শনে আমরা দেখি, পদার্থসমূহ (categories) একদিকে যেমন বুদ্ধির দ্বন্দ্ব-সমন্বয় পদ্ধতিতে লব্ধ ব্যাপক ধারণা বা বিধেয় বিশেষ, অন্যদিকে এরা বাস্তব জগতের সাথে অভিন্ন (ঘোষ: ১৮৬)। সমন্বয় বা সংশ্লেষণের ত্রয়ী পদ্ধতিতে হেগেল গুণ ও পরিমাণ থেকে পরিমাপ, শুদ্ধ সত্তা ও অ-সত্তা হতে মূর্ত সার্বিক গঠন করেন। হেগেলের দর্শনে দ্রব্য ও কর্ম, কারণ ও কার্য, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি ধারণাসমূহ এভাবে গঠিত হয়।

নব্য-ন্যায় দর্শন বাস্তববাদী ও বিশ্লেষণমূলক। এরিস্টটলের প্রকরণগুলো অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত। কান্টের প্রকরণগুলো যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতাপূর্ব অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত। হেগেলের প্রকরণ-চিন্তা অধ্যাত্মবাদী। কান্ট-হেগেলের তুলনায় রঘুনাথের পদার্থ-চিন্তা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হলেও এতে সমকালীন যুক্তিবিদ্যা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি ও ভাষা দর্শনের বিন্যাস ও বিকাশ সুস্পষ্টভাবে ক্রিয়াশীল। রঘুনাথ তাঁর অধিবিদ্যক চিন্তায়

বাস্তববাদী ধারণা ও ভাষার অর্থবোধকতার মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর অধিবিদ্যায় নব্য-ন্যায় দর্শনের সাধারণ নীতি, "অস্তিত্ব জ্ঞেয়ত্ব অভিধেয়ত্ব" অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে তা জানা যায় ও নামকরণ করা যায়, পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। তিনি কেবল পদার্থগুলোর বর্ণনা দেননি, এগুলো ভাষার ক্ষেত্রে ব্যবহারের পর বাক্যগুলো যাতে যৌক্তিক ও অর্থপূর্ণ হয় সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন। হেগেলের দর্শনে আমরা এ রকম একটি মূলসূত্র (maxim) দেখতে পাই, 'যা বাস্তব তা-ই বৌদ্ধিক এবং যা বৌদ্ধিক তা-ই বাস্তব'। হেগেল মনে করেন যে, বাস্তবসত্তা হলো সার্বিকবা বাস্তবতার মাত্রানুসারে ক্রমশৃঙ্খলায় বিন্যাসিত ধারণাসমূহের একটি পদ্ধতি। এখানে সবার উপরে রয়েছে সর্বোচ্চ সার্বিক ধারণা। হেগেলের মতে ধারণাগুলো পরস্পর যৌক্তিক সম্পর্কে আবদ্ধ। বাস্তবসত্তা হলো একটি জৈব ঐক্য (organic unity)। কোনো জৈবিক ঐক্যে অংশ সমগ্রের উপর এবং সমগ্র অংশের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই বাস্বসত্তা যৌক্তিক। অর্থাৎ ধারণাগুলো যৌক্তিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। যা কিছু যৌক্তিক তাকে বলা হয় বৌদ্ধিক। তাই বাস্তবসত্তা ও বৌদ্ধিকতা অভিন্ন (ইমাম, ২০০৭: ২১৩)।

সমকালীন দর্শনে বিশ্লেষণী অধিবিদ্যার যে পুনর্জাগরণ আমরা দেখি (যেমন: স্ট্রসন, কোয়াইন, ডেভিডসনের দর্শনের মাধ্যমে), ঠিক সে রকম প্রক্ষেপণ খুঁজে পাওয়া যায় রঘুনাথের *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* বইয়ে। তিনি সাধারণ ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে পদার্থের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এমন এক ধরণের নতুন অধিবিদ্যক চিন্তা তুলে ধরেছেন যা আমাদের লৌকিক অভিজ্ঞতায় ব্যবহৃত মানস গঠন অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এভাবে তিনি তাঁর অধিবিদ্যক চিন্তার সাথে সাধারণ ভাষা ব্যবহারের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে হিউম কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকার করেননি এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বলে বিবেচনা করেছেন। রঘুনাথ কার্য ও কারণকে আলাদা আলাদা পদার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি দিক্, কাল, ও আকাশ বা ইথারকে ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত করলেও বস্তুগত ও জাগতিক ঘটনাবলিকে দৈশিক ও কালিক প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার জন্য ক্ষণ (সড়সবহঃ) নামক একটি স্বতন্ত্র নতুন পদার্থ তালিকাভুক্ত করেছেন যা তাঁর নব্য চিন্তার প্রমাণ বহন করে। শেলডন পোলক রঘুনাথের অর্থবোধকতা চিন্তার বিবেচনায় পদার্থ উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে বলেছেন metalinguistic innovations যা তাঁর চিন্তার প্রাঞ্জলতা ও উচ্চমার্গীয়তা প্রতিফলিত করে। পোলক রঘুনাথের পদ্ধতিকে বলেছেন, 'transformation in discursive style' (Pollock, 2001b)। গানেরি তাঁর আলোচনাকে অভিহিত করেছেন 'an originality in content' and 'invention of new modalities of articulation' বলে (Ganeri, 2013:

73)। আমি রঘুনাথ শিরোমণির অধিবিদ্যক আলোচনাকে নব্য-অধিবিদ্যা বলেছি এ কারণে যে, অধিবিদ্যক ধারণার স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার সাথে ভাষা-বিশ্লেষণ ও ভাষার অর্থতত্ত্বের সাথে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা তিনি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপসংহার

বাস্তবতা (reality), সত্তা (being), ও অস্তিত্ব (existence) এর তাত্ত্বিক আলোচনা হলো অধিবিদ্যা। এখানে বাস্তবতার প্রকৃতি (the nature of reality) ও এর গঠন নিয়ে দার্শনিক পাঠ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দর্শনালোচনার সূত্রপাত হয় মূলত অধিবিদ্যক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান ও অধিবিদ্যক ধারণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। 'বস্তুর বা আমাদের পরিচিত এই বস্তুজগতের আদি কারণ কী বা বস্তুসত্তার অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য কী?' - এ রকম প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। অধিবিদ্যা নিয়ে যেসব দার্শনিক আলোচনা করেছেন তাঁরা মূলত বাস্তবতার সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য এবং বাস্তব সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সবচেয়ে মৌলিক নীতিগুলো উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। এই অর্থে অধিবিদ্যার কাজ হলো আমাদের সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোর বিশ্লেষণ এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন বহুমুখী আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান। এগুলো এমন কিছু ধারণা যা একজন যুক্তিবাদী মানুষ তার চারপাশের জগতের অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ করার জন্য জানতে চায়। এই অর্থে, অধিবিদ্যা হলো "a massive central core of human thinkingÓ (Strawson, 1959: 10)।

বাঙালি দর্শনে অধিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা একটি ব্যাপক বিস্তৃত স্থান দখল করে রয়েছে যার প্রক্ষেপণ আমরা দেখি রঘুনাথ শিরোমণির দর্শনে। উপমহাদেশীয় দর্শনে প্রমাণশাস্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর ভিত্তি। ন্যায় দর্শনে আমরা যেমন দেখি "প্রমাণশাস্ত্র" ব্যাখ্যায় জ্ঞানের সাথে বাস্তবতা (reality) এর সম্পর্ক অনুসন্ধান করা হয়েছে। নব্য-নৈয়ায়িকগণ অনুসন্ধানের এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন এবং শিরোমণির ক্ষেত্রে আলোচনায় নতুনত্ব ও গভীরতা থাকলেও প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। প্রমাণতত্ত্বের পরিপূরক হলো প্রমেয় তত্ত্ব। প্রমাণ হলো জ্ঞানের উপায়, আর প্রমেয় হলো যাকে জানা যায় –জ্ঞানীয় সত্তা যা জগত গঠন করে। এই সত্তার সংখ্যা ও প্রকরণ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই যে জীবন, মোক্ষ ও জগতকে বোঝার জন্য বাস্তবতার জ্ঞান (knowledge of reality) একটি অপরিহার্য ও অনিবার্য শর্ত। তাই অধিবিদ্যক সমস্যাগুলোকে তাঁরা যেমন তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করেছেন তেমনি একইসাথে ব্যবহারিকভাবেও গ্রহণ করেছেন।

শিরোমণি জ্ঞানকে বাস্তবতাবর্জিত বলে মনে করেননি। বাস্তবতার সমস্যাকে জ্ঞানের সমস্যা থেকে আলাদা করা যায় না। তিনি তাঁর আলোচনায় "অস্তিত্ব", "অভিধেয়ত্ব" (নামবাচকতা), ও "জ্ঞেয়ত্ব" (জ্ঞানগোচরতা) কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। তাঁর দর্শনে পদার্থগুলো জ্ঞানগোচর ও ভাষায় প্রকাশযোগ্য। তিনি তাঁর প্রকরণগুলোকে কেবল আকার (form) হিসেবে বিবেচনা করেননি বরং জ্ঞানের বিষয় (objects of knowledge) হিসেবে দেখেছেন। তাঁর দর্শনে প্রকরণগুলো নাম বা ভাষিক কল্পনা নয়; এগুলোর ভাষাগত তাৎপর্য বিদ্যমান যার সাথে প্রচলিত ভাষার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ভাষা নিজেই একটি অধিবিদ্যক ধারণা এবং অধিবিদ্যক ধারণাগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিরোমণি তাঁর পদার্থতত্ত্বনিরূপণ বইয়ে ভাষাকে একটি যথাযথ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে সফল হয়েছেন।

পাশ্চাত্য দর্শন-চিন্তার একত্ববাদ (monism), দ্বৈতবাদ (dualism), ও বহুত্ববাদ (pluralism)–এর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় শিরোমণি একজন বহুত্ববাদী। তিনি জগতে বহু বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন যেখানে আটটিকে তত্ত্ববিদ্যক প্রকরণ (পদার্থ) বলে চিহ্নিত করেছেন। কার্যকারণ সম্বন্ধ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। সকল প্রকার ভৌত পদ্ধতি (physical systems) বোঝার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং কারণিক সম্বন্ধকে অধিবিদ্যার কেন্দ্রীয় সমস্যা (the central problem in the metaphysics) বলে অভিহিত করা হয় (Field, 2003:443)। 'the causal structure of a process is intrinsic to it' (Hall, 2004: 255) – এই দাবিকে কেন্দ্র করে সমসময়ের দর্শনে এক ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। অথচ এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় শিরোমণির দর্শনে এবং তাঁর দর্শনে ব্যবহৃত 'অবচ্ছেদ' ধর্মের মাধ্যমে এ বিতর্কের সমাধান পাওয়া যায়। সমকালের বিজ্ঞান দর্শনে স্বত্ব নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রাকৃতিক স্বত্ব প্রাকৃতিক প্রকরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিনা বা এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে কিনা –বিতর্কটি গভীর আলোচনার বিষয়। শিরোমণি স্বত্বকে স্বতন্ত্র পদার্থের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি কালকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে বিবেচনা করেননি। সমকালীন অনেক দার্শনিকের কাছে কাল হলো, 'a dark subject of speculation, enigmatic and even incomprehensible (Taylor, 1992: 68)। সংখ্যা নিয়ে পর্যালোচনা গ্রিক দর্শন থেকে শুরু করে সমসময় পর্যন্ত বিস্তৃত। সংখ্যা কি গুণ, না কি বস্তুর অন্তর্জাত বিষয়? সংখ্যাকে গুণ বাব স্তুর অন্তর্জাত বিষয় বলে স্বীকার করলে বহুমুখী যৌক্তিক ভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই শিরোমণি একে আলাদা পদার্থের মর্যাদা দিয়েছেন। রঘুনাথ শিরোমণির নব্য-অধিবিদ্যক চিন্তা ছিল সময়ের তুলনায়

অনেক বেশি প্রগতিশীল ও অগ্রগামী। বাঙালি দর্শন চিন্তায় আধুনিকতার পুরোধা রঘুনাথের দর্শন–ভাবনা নিয়ে বর্তমান সময়ের গবেষকগণ সমকালীন দর্শন, বিজ্ঞান দর্শন, সমকালীন পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির আলোকে সমীক্ষণী বিশ্লেষণ (critical analysis) করতে পারেন। এতে করে বাঙালির নিজস্ব দর্শন (indigenous philosophy) চিন্তার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

রঘুনাথ শিরোমণি *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল একটি নতুন ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা এবং তাঁর এ বৌদ্ধিক যাত্রা সফল ছিল। বৈশেষিক ও ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বাস্তববাদকে তিনি কিছু যৌক্তিক প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী নবদ্বীপ, মিথিলা, ও বারাণসী দার্শনিকগণ তাঁর যুক্তি ও যুক্তি-প্রক্রিয়া নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কোনো কোনো দার্শনিক ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সাতটি পদার্থ গ্রহণ করলেও তাঁর পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার অনেকেই শিরোমণির নব্য-অধিবিদ্যার আলোকে তাঁদের নিজ নিজ দর্শন আলোচনা করেছেন (Ganeri, 2011: 205)। রঘুনাথের দর্শন প্রভাবে তৎকালীন বাংলা হয়ে উঠে "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ"। এখন প্রয়োজন বাঙালি দর্শনের এ উচ্চমার্গীয় ধারার আকর গ্রন্থগুলোর সরল অনুবাদ, পঠন-পাঠন, এবং ব্যাপক গবেষণা ও বিশ্লেষণ।

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নংভট্ট। ২০০৬। *তর্কসংগ্রহ* (নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী অনূদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

ইমাম, পারভেজ। ২০০৭। *হেগেল: জীবন ও দর্শন*। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ। ২০০৪ (২য় সংস্করণ)। *ভারতীয় দর্শন*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

ভট্টাচার্য, করুণা। ১৯৯০। *ন্যায় বৈশেষিক দর্শন*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র। ১৯৫২। *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান: বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

শিরোমণি, রঘুনাথ। ১৯৭৬। *পদার্থতত্ত্বনিরূপণ* (মধসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য কর্তৃক অনূদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

Alom, Md. Masud. 2018. "The Feature of Analytical Approach to Navya-Nyāya", PhD Dissertation, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, Bangladesh.

Field, H. 2003. 'Causation in a Physical World', in M. Loux and D. Zimmerman (eds.), *The Oxford Handbook of Metaphysics*, Oxford: Oxford University Press, pp. 435–60.

Ganeri, J. 2011. *The Lost Age of Reason: Philosophy in Early Modern India 1450–1700*. Oxford: Oxford University Press.

Ganeri, J. 2013. "Raghunātha Śiromaṇi and the Origins of Modernity in India", *Nyāya Studies in Indian Culture and Buddhism: Sambhasa*. pp. 30–55.

Hall, N. 2004. 'The Intrinsic Character of Causation', in D. Zimmerman (ed.), *Oxford Studies in Metaphysics*, Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, pp. 255–300.

Ingalls, Daniel H. H. 1951. *Materials for the Study of Navya-Nyāya Logic*. (Harvard Oriental Series 40) Massachusetts: Harvard University Press.

Strawson, P. F. 1959. *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics*. London: Routledge.

Taylor, R. 1992. *Metaphysics*. 4th edition, New Jersey: Prentice Hall.

Wada, T. 2007. *The Analytical Method of Navya-Nyāya*. Groningen: Egbert Forsten.

Williams, M. 2017. "Raghunātha Śiromaṇi and The Examination of The Truth about Categories", in *The Oxford Handbook of Indian Philosophy* (ed. By Jonardon Ganeri). Oxford: Oxford University Press.